উৎসর্গপত্র

সেইসব দারোগাদের উদ্দেশ্যে
আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম

ভূমিকা

বাংলায় রহস্য কাহিনি লেখার চল বহুদিনের। ২০২৩ সালে এল এফ বুকস ইন্ডিয়ার উদ্যোগে সেই ইতিহাসকে ফিরে দেখার লক্ষ্যে প্রথম বের হয় 'দারোগা যখন গোয়েন্দা'-র প্রথম খণ্ড। আমরা ঠিক করেছিলাম এটাই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়ন ঘটেনি। এবছর নতুনভাবে নতুন নামে 'দুষ্প্রাপ্য গোয়েন্দা সংগ্রহ' (সেকালের রহস্য কাহিনির সরলীকৃত পাঠ) প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির যে উজ্জ্বল উদ্ধারের কাজ 'দারোগা যখন গোয়েন্দা' বইটিতে শুরু হয়েছিল, তারই নবতম উপস্থাপন করা হয়েছে এই বইয়ে। 'দারোগা যখন গোয়েন্দা' সিরিজের গল্পগুলো তো রাখা হয়েইছে সঙ্গে আরও নতুন গল্প সংযোজন করা হয়েছে। সব গল্পই এক অর্থে কোনও গোয়েন্দা গল্প নয়, বরঞ্চ একে পুলিশের দারোগাদের নিজের হাতে সমাধান করা কিছু কেস হিস্ট্রি বলা যেতে পারে।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গোয়েন্দা গল্প প্রথম প্রকাশ হয় মোটামুটি ১৮৯৬ সালের আশপাশে। পুলিশের দারোগা বাকাউল্লার কীর্তিকলাপ-কেই বাংলার প্রাচীনতম গোয়েন্দা বই বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সেই বইয়ের ঘটনাক্রম আনুমানিক ঊনবিংশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত। কেননা ভারতে ইংরেজরা পুলিশি ব্যবস্থা প্রচলন করেন ঊনবিংশ শতকের ত্রিশের দশকেই। খুব স্বাভাবিকভাবেই যথার্থ ডিটেকটিভ গল্প তার পরপরই লেখা হয় বলে মনে করাটা খুব একটা ভুল হবে না। এই বইটিতে সেই প্রথম দিককার গল্প আমরা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছি। সেখানে মোটামুটিভাবে গল্পগুলোর ঘটনাবলী ঊনবিংশ শতকের ষাট বা সত্তরের দশক পর্যন্ত সাজানো ছিল। গল্পগুলো বেশিরভাগ কালানুক্রমিক ভাবেই সাজানো হয়েছিল। কিছু কাহিনি আবার তার পরবর্তীকালের ঘটনা হিসেবেই সাজানো রইল। এই বইটিতে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনিগুলো 'দারোগার দপ্তর' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া। এই গল্পগুলোর ঘটনাকাল ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ। নিশ্চিতভাবেই এই গল্পগুলোর বিষয় ভাবনা পাঠককে আশ্চর্য করবে। কারণ পাঠক এগুলো পড়তে পড়তে একেবারে সাম্প্রতিক ঘটনার কিছুটা ছাপ লক্ষ করবেন। আর এখানেই সেই প্রাচীন গল্পগুলোর সার্থকতা।

একটি গল্প নেওয়া হয়েছে গিরিশচন্দ্র বসুর 'সেকালের দারোগার কাহিনী' বইটি থেকে। এই গল্পটির সময়কাল ঊনবিংশ শতকের ছয়ের দশক। তিনি সম্ভবত ১৮৫৩ থেকে ১৮৬০ সাল নাগাদ

নদীয়ার শান্তিপুর অঞ্চলের দারোগা ছিলেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উনিশ শতকের নয়ের দশকে তিনি নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই বইয়ের আকারে প্রকাশ করেন। অবশ্য বইতে তিনি দারোগা হিসেবে নিজের নাম ব্যবহার করেননি। গল্পটি প্রথম পুরুষের জবানীতেই লেখা হয়েছে। অপরাধী ধরতে গিয়ে কেবলমাত্র নিজের সাহস আর বুদ্ধির জোরে দারোগা কীভাবে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন, সেই ঘটনাই এই বইয়ের গৃহীত গল্পের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। যে কারণে এই ঘটনাটি চাকরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার অনেকদিন পরেও লেখকের মনের মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করছিল। সে যুগের একজন সামান্য টাকা মাইনের পুলিশের দারোগা নিজের কাজের প্রতি কতটা আন্তরিক থাকলে এভাবে জীবন বিপন্ন করেও অপরাধীকে ধরার উদ্যোগ নিতে পারে তা মনে রাখার মতোই।

এই গ্রন্থের পাঠক তিনজন দারোগার অপরাধ সমাধানের গল্প পড়বেন—গিরিশচন্দ্র বসু, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। গিরিশচন্দ্র বসু (১৮২৪! থেকে ১৮৯৮), এনার মূল চরিত্র মুস্তাফি দারোগা। উত্তম পুরুষে কথক গিরিশচন্দ্র নিজেই। আমরা মোট চারটি গল্প রেখেছি এই গ্রন্থে। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫ থেকে ১৯৪৭) বিখ্যাত চরিত্র দারোগা প্রিয়নাথ। এই গ্রন্থে আটটা কাহিনি আছে প্রিয়নাথকে নিয়ে। আর সব শেষে রাখা হয়েছে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬৩ থেকে ১৯১৯) চারটি কাহিনি। মূল চরিত্র দারোগা বরকতুল্লা।

প্রত্যেকের কাজের ধরন অন্যের থেকে আলাদা তো বটেই। তার সঙ্গে তাদের দেওয়া বর্ণনার মধ্যে প্রাচীনত্বের স্বাদ এবং এক নতুন আকর্ষণ পাঠক খুঁজে পাবেন। কারণ প্রতিটি গল্পেরই বিষয় ভাবনার মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। গল্পগুলো পড়তে পড়তে তৎকালীন গ্রাম বাংলার সমাজজীবনের একটা পরিষ্কার ছবি ভেসে উঠবে পাঠকের চোখের সামনে।

গল্পগুলোর মধ্যে প্রাচীনত্বের স্বাদ নেওয়ার পাশাপাশি এক নতুন রস খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। প্রতিটি গল্পেরই বিষয় ভাবনার মধ্যে একটা অদ্ভুত মোচড় ছিল। পাঠক গল্পগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন তৎকালীন গ্রাম বাংলার সমাজজীবনের একটা আভাস বা রূপরেখা লক্ষ করেছিলেন; আবার অন্যদিকে ইতিহাসের ছোঁয়ায় এক পুরোনো দিনের গন্ধও ছিল সেখানে। সেইজন্যই, ওই বইটির গল্পগুলো শুধুমাত্র নিরস দারোগা বনাম অপরাধীদের গল্প হয়েই থেমে থাকেনি। গোয়েন্দা গল্পের মাপকাঠি ছাড়িয়ে বইটির গল্পগুলো পাঠককে আরও অনেকটা কল্পনার জগতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এই গল্পগুলো রোমাঞ্চকর রহস্য উদ্ঘাটনের কাহিনি হিসেবে যেমন উপভোগ্য তেমনি এর মধ্যে সমাজ পর্যবেক্ষণের দিকটিও পাঠককে উৎসাহিত করবে। আপনাদের জেনে রাখা দরকার যে আগের বইটির মতো এই বইয়ের গল্পগুলোর কোনও চরিত্রই কিন্তু কাল্পনিক নয়। তাছাড়া গল্পগুলো সেকালের মানুষের জীবনযাত্রা, সরকারি কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা কিংবা সমাজচিত্রের প্রতিফলক হিসেবেও তাৎপর্য লাভ করেছে।

লেখা নানান ধরনের হয়। কিছু লেখার মধ্যে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি সরাসরি দেখা যায় না। আবার কিছু লেখার মধ্যে দেশ কালের নানা রকম ছবি ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে লেখকের চিন্তাধারার মিশেল ঘটে লেখাটিকে একটা আলাদা মাত্রা দেয়। লেখকের চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে ঘটনাবলি যখন পাঠকের চোখের সামনে হেঁটে চলে বেড়ায়, তখনই সেই লেখা পাঠকের মনে রসের সঞ্চার করে। ঐ লেখা স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে ধরে যায়। সচেতন পাঠক আবার লেখার মধ্যে দিয়ে রচনাকালকে জানতে বা বুঝতে চান। লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠকের সেই জানার আগ্রহকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্বও থাকে লেখকের উপর।

আমাদের দেশে লেখা অনেকরকম রয়েছে। কিন্তু আগেকার দিনের ঘটনাবলি সম্পর্কে এদেশে খুব বেশি লেখা হয়নি। আজকের দিনে পুরানো দিনের লোকজনেরাও তাঁদের যুবক বয়সের ঘটনাই মনে করতে পারেন না, লিখে রাখা তো দূরের ব্যাপার। এই বইতে ব্রিটিশ শাসনকালে গোয়েন্দা পুলিশের নানারকম ঘটনার কথা গল্পের আকারে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশ আমল থেকেই পুলিশের গঠন শুরু হয়। প্রধানত আইন কানুন সমাজে বজায় রাখার কারণেই পুলিশ ডিপার্টমেন্টের উৎপত্তি। নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই পুলিশ তার আজকের চেহারা লাভ করেছে। কিন্তু সেই আমলের পুলিশের ঘটনাবলি লিখে রাখার কোনোরকম চেষ্টাই আজ অবধি তেমনভাবে করা হয়নি। কয়েকজন দারোগার জীবনের কিছু তদন্তের কথা বিক্ষিপ্ত ভাবে লেখা হয়েছে। কিন্তু খুব বেশি কিছু নয়। সেসব লেখা আবার খুব একটা সহজলভ্যও নয়। এই বইয়ের কাহিনিগুলো আসলে সে যুগের কয়েকটি ঘটনার সমষ্টি যা পড়ে পাঠক সে সময়ের একটা ধারণা পাবেন। এই বই কেবলমাত্র পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য নয়, সেই আমলের পুলিশের কাজের ধরন ধারণ সম্পর্কে একটা ধারণা এই বইটি থেকে পাওয়া যাবে। শুধুমাত্র চোর ধরার কাহিনি নয়, পুলিশের প্রথম যুগের গোয়েন্দাদের কাজের প্রণালি বুঝতে সাহায্য করবে এই গল্পগুলি।

এই বইয়ের ঘটনাবলি প্রধানত উনিশ শতকের ছয়ের দশকের। সেই সময়টা ছিল খুবই অস্থির। খুব তাড়াতাড়ি সব কিছুর পরিবর্তন ঘটছে। সে সময় গ্রাম বাংলায় নিয়মিত ডাকাতি হত। ব্রিটিশ আমলে জমিদারের পুলিশ আর সরকারি পুলিশ আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করত। ফলে অপরাধীদের ধরার ব্যাপারে সমন্বয়ের অভাব দেখা দিত। লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলেই প্রথম থানাগুলোর এলাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর 'থানাদার' পদটি উঠিয়ে দিয়ে 'দারোগা' পদটি তৈরি করা হয়। গ্রামের চৌকিদারদের রাখা হল সেই দারোগাদের অধীনে। তারপর দারোগাদের কাজের পদ্ধতিও বদলে গেল কালের নিয়মে। আজকের গোয়েন্দা পুলিশের জন্মের অনেক বছর আগেই।

তখনও পর্যন্ত পুলিশের উঁচু পদে সাহেবদেরই রাখা হত। লেখাপড়া জানা উঁচু বংশের ভারতীয় যুবকদের তখনও পর্যন্ত সেভাবে পুলিশের কাজে দেখা যেত না। এই কারণেই হয়তো ভারতীয় পুলিশ কর্মচারীদের অভিজ্ঞতার কথা আজ অবধি খুব বেশি পাওয়া যায়নি। তাই ধরেই নেওয়া যায় যে শিক্ষিত যুবকেরা সে সময় দারোগার চাকরিতে তেমন উৎসাহ দেখাত না।

তবে পরবর্তী সময়ে অবস্থাটা একটু বদলে গেল। লেখাপড়া জানা যুবকেরা পুলিশের চাকরিতে উৎসাহ দেখাতে শুরু করল। তাই সেসব দারোগাদের অপরাধী ধরার ধরনটাও একটু অন্যরকম হতে থাকল। আসলে অপরাধের বদলে যাওয়া ধরন ধারণ পুলিশের কাজেও একটা বিবর্তন আনল বলা যায়।

এই বইয়ের সমস্ত ঘটনাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক। কিন্তু এগুলোকে ঠিক সেই অর্থে স্মৃতি কথা বলা যায় না। ঘটনাগুলো রোমাঞ্চকর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ঘটনাগুলি থেকে সচেতন পাঠক তাঁদের ভাবনার রসদ পাবেন নিশ্চয়ই। দারোগাদের অপরাধী ধরার পদ্ধতি, কিংবা তাঁদের সাহসিকতা পাঠককে গল্পের শেষ অবধি আটকে রাখবেই। এই বইয়ের গল্পগুলো কয়েকটি গল্পের সমষ্টি হলেও এর কোনও চরিত্রই কাল্পনিক নয়। যদিও গল্পের খাতিরে চরিত্রগুলির নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঘটনাগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর। লেখার ভাষাও যথা সম্ভব আধুনিক করা হয়েছে পাঠকের বোঝার কারণে।

এই দুষ্প্রাপ্য কাহিনিগুলোর সরলীকৃত পাঠ, একেবারে নতুন ভাবে নবীন প্রজন্মের কাছে সিরিজের আকারে ছাপার জন্য নির্বাচন করে এলএফ বুকস প্রকৃতপক্ষে পুরোনো দিনের

ঘটনাবলির সঙ্গে আজকের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এক গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা একটা বিরাট ঝুঁকির কাজ। কারণ এই জাতীয় দুষ্প্রাপ্য কাহিনির অবিকৃতপাঠ অনেক বের হয়েছে নানা প্রকাশনা থেকেই। কোনও সন্দেহ নেই যে এলএফ বুকসের এই প্রয়াস একেবারেই একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। শুধুমাত্র ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে তাদের এই ধরনের একটা বইপ্রকাশ করার প্রচেষ্টা কিংবা পাঠকদের সচেতন করার দিকটিও যথেষ্ট প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

বাংলার রহস্য রোমাঞ্চ গল্পের যে ধারা সেই প্রাচীন কাল থেকে বয়ে চলেছে, তাকে আমরা একরকম উজ্জ্বল উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি এই 'দুষ্প্রাপ্য গোয়েন্দা সংগ্রহ' সিরিজটিতে। পাঠকদের ভালো লাগলেই আমাদের প্রয়াস সঠিক বলে মনে করা যেতে পারে।

সবশেষে বলি, আমাকে প্রকাশক নানাসময়ে অনেকগুলো বইয়ের কপি দিয়ে লেখার বিষয়ে নানারকম তথ্য সংগ্রহের কাজে বিশেষ সাহায্য করেছেন এবং অবশ্যই ঐ সমস্ত পুরোনো বইয়ের সঙ্গে আমারও পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সেজন্য কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়, আমি সমগ্র এলএফ বুকসের টিমকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তাছাড়া আমাকে এইরকম একটা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রকাশককে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

কলকাতা বইমেলা ২০২৫ **সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়**

গিরিশচন্দ্র বসু

অথ নাকাশীপাড়া বৃত্তান্ত ১৫
মনোহর ঘোষ ২৯
চোরের আবদার ৩৯
সাহেব চোরের কিসসা ৪৭

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

অজানা মৃতদেহ ৫৩
নকল পয়সার কেলেঙ্কারি ৭৪
নীল চুরির কিসসা ৮৪
মৃত মানুষের কীর্তি ১০৪
লক্ষ্যভেদী প্রিয়নাথ ১১৮
একটি না-মানুষের কাহিনি ১৫১
তিন ডাকাতের কিসসা ১৬৯
অপরাধী ডাক্তারবাবু ২০৬

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নথি জালিয়াতির রহস্য ২৩১
চোর বনাম দারোগার টক্কর ২৩৮
হারানী ২৪৪
হরিদাস বনাম কৃষ্ণদাস ২৪৯

গিরিশচন্দ্র বসু

লেখকের জন্ম ১৮২৪! (মতান্তর আছে) সালে এবং মৃত্যু ১৮৯৮। ১৮৫৩ থেকে ১৮৬০ সাল নাগাদ নদীয়ার শান্তিপুর অঞ্চলের দারোগা ছিলেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উনিশ শতকের নয়ের দশকে ঘটে যাওয়া নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর রচনাতে তুলে ধরেছেন। লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনা 'সেকালের দারোগার কাহিনী', 'সিরাজ্জদ্দৌলা', এবং সেকালের সত্যিকারের গোয়েন্দাগিরির প্রধান চরিত্র 'মুস্তাফি দারোগা'।

অথ নাকাশীপাড়া বৃত্তান্ত

এক

আজকে আপনাদের একটা মজার গল্প বলব। যদিও এটাকে গল্প বলা ঠিক হবে কি না জানি না। আসলে এই ঘটনাটা আমার দারোগার চাকরি জীবনের অন্যতম সেরা ঘটনা বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। আপনারা সকলেই কৃষ্ণনগর জেলার নাম শুনে থাকবেন। সেখানে নাকাশীপাড়া নামে একটা বিখ্যাত জায়গা ছিল। সেখানে খুব বেশি লোকের বসতি নেই। গ্রামটাও খুব একটা বড়ো নয়। সেখানে কেবল একজনই জমিদার ছিলেন। বস্তুত গ্রামখানার যেটুকু পরিচিতি ছিল তা সেই জমিদারের জন্যেই হয়েছিল। সেই জমিদারেরা ছিলেন আসলে একজন রাজপুত বংশীয় বিরাট এক বড়োলোকের সন্তান। কথিত আছে যে এদের পূর্বপুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধীনে চাকরি করে অনেক সম্পত্তি উপার্জন করেছিলেন। তারপর আর তিনি নিজের জায়গায় ফিরে না গিয়ে এই নাকাশীপাড়াতেই বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এরপর সেই ব্যক্তির সন্তান সন্ততিরা নানারকম ব্যবসাপত্র করে তাদের সম্পত্তির পরিমাণ আরও অনেকগুণ বাড়িয়ে ফেলেন। ধীরে ধীরে তারা পুরো কৃষ্ণনগর জেলার জমিদারদের মধ্যে রীতিমতো গণ্যমান্য জমিদার হয়ে উঠেছিলেন।

আপনাদের আগেই বলেছি যে নাকাশীপাড়ার জমিদারদের আদি পুরুষ ছিলেন রাজস্থানের লোক। কিন্তু তার সন্তান সন্ততিরা বেশ কয়েক পুরুষ ধরে বাংলায় বসবাস করতে করতে পুরদস্তুর বাঙালিই হয়ে গিয়েছিলেন। তবুও একথা মানতেই হবে যে তাদের মধ্যে তখনও পর্যন্ত রাজপুত রক্তের গুণাবলি কিছুমাত্র কমে যায়নি। অবশ্য এখনকার ছেলে ছোকরাদের কথা আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমার সঙ্গে নাকাশীপাড়ার যমদ্বার বংশের যে সমস্ত বাবুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল, তারা সকলেই বিলক্ষণ বলশালী পুরুষ ছিলেন। একার হাতে তারা দশ বিশজনের মহড়া নিতে পারতেন। আর তাদের প্রত্যেকের আস্তাবলে তিন চারটে করে বেশ ভালো জাতের ঘোড়া থাকত। তারা কেউ পারতপক্ষে পালকি কিংবা হাতিতে চড়ে চলাফেরা করতেন না। আসলে তাদের কাছে ঘোড়াই ছিল সবথেকে পছন্দের বাহন। আমি দেখেছি যে কৃষ্ণনগর জেলার বাঙালিদের মধ্যে কেউই নাকাশীপাড়ার জমিদার বাবুদের মতোন ঘোড়ায় চড়তে পারদর্শী ছিল না। আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় সাধারণ লোক বেশিরভাগ সময়েই কিন্তু পালকি চড়েই যাতায়াত করত। আর একটু বড়োলোক কেউ হলে তারা হাতিতে চলাফেরা করত। পুলিশের লোক ছাড়া কিংবা ইংরেজ কর্মচারী ছাড়া খুব বেশি কেউ ঘোড়ায় চড়ত না।

সে যা হোক। এবার আপনাদের গ্রামটার সম্পর্কে কিছু কথা জানিয়ে রাখি। নাকাশীপাড়া গ্রামটা বেশ ছোটো। গ্রামের চারদিকে ধু ধু মাঠ দিয়ে ঘেরা ছিল। আগে এই জায়গাটা পূর্ব দিকের কাটোয়া মহকুমার অধীনস্থ অগ্রদ্বীপ থানার অন্তর্গত ছিল। পরে অবশ্য নাকাশীপাড়াতেই থানা তৈরি হয়। যে কারণে সেখানে থানা তৈরি হল, আজকে সেই কথাই আপনাদের সামনে বলব।

সেই গ্রামে জমিদার আর তাদের কয়েক ঘর প্রজার বসবাস ছিল। জমিদারবাবুদের বাড়িখানাকে শুধু বাড়ি না বলে অট্টালিকাই বলা ভালো। সেকালের ডাকাতদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বিশেষভাবে তাদের বাড়িটা তৈরি করা হয়েছিল। জমিদার গ্রামের মধ্যে সুন্দর পুকুর থেকে আরম্ভ করে আমোদ প্রমোদের উপকরণ হিসেবে বেশ কয়েকটা বাগিচাও তৈরি করিয়েছিলেন। এর ফলে গ্রামের শোভাও অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল।

নাকাশীপাড়ার পশ্চিমে কিছুদূরে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে গোটপাড়া নামে আরেকটা গ্রাম ছিল। নাকাশীপাড়া আর সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের গঙ্গাস্নান, শবদাহ কিংবা অন্যান্য শুভকাজের জন্যে গোটপাড়ায় যেতে হত। অবশ্য ঐ গোটপাড়াও নাকাশীপাড়ার জমিদারদের অধীনেই ছিল। আমি যখন নাকাশীপাড়ায় গিয়েছি, তখনও পর্যন্ত কৃষ্ণনগর থেকে মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ দিক অবধি ঐ জমিদারদের আধিপত্য ছিল। বহরমপুর থেকে কলকাতা যাওয়ার বড়ো রাস্তার পাশে মোটামুটি পঁচিশ ক্রোশ অবধি অঞ্চলের মধ্যে অন্য ছোটো খাটো জমিদার থাকলেও পুরো এলাকাটায় নাকাশীপাড়ার জমিদারদের কথাই ছিল শেষ কথা। এদের যেমন টাকাপয়সা ছিল, তেমনি জায়গা জমি ছিল। প্রবাদ আছে যে এদের বাড়িতে একটা বিশাল ঘরে একটা পেল্লায় সিন্দুকের মধ্যে গয়নাগাটি, টাকাকড়ি সব রাখা থাকত। সেই ঘরখানাকে বেষ্টন করে শরিকেরা তাদের অন্দরমহল তৈরি করিয়েছিলেন।

সুতরাং সেই সিন্দুকের ঘরে যেতে হলে জমিদার বাবুর বাড়ির বাহির মহল আর অন্দর মহল দুটোই পেরিয়ে যেতে হত। ফলে বুঝতেই পারছেন যে সেখানে পৌঁছনো খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। সেই ঘরের মোটা কাঠের দরজা সবসময়েই বন্ধ করা থাকত। দরজায় সমস্ত শরিকের কর্তার আলাদা আলাদা তালা লাগানো ছিল। সিন্দুকের ঘর খুলতে হলে সমস্ত শরিক একত্র না হলে কিংবা রাজি না হলে সেটা খোলার কোনও উপায়ই থাকত না।

সিন্দুকে কত টাকা ছিল তা তখনকার শরিকেরাও ঠিকমতো জানতেন না। তবে সবারই একটা বিশ্বাস ছিল যে ঐ সিন্দুকের ধনরত্ন কোনোদিন শেষ হওয়ার নয়। আপনারা নিশ্চয়ই সেই প্রবাদটা জানেন যে পরের ধন আর নিজের আয়ু কেউই কোনোদিন কম করে দেখে না।

সমস্ত সাধারণ প্রজাদের মতোই শরিকদেরও অনেকেরই ধারণা ছিল যে সেখানে না জানি কত রাজার ধন লুকনো আছে। যতদিন পর্যন্ত সেই সিন্দুক খোলা না হয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত জমিদারবাবুদের সম্মান আর গৌরবের কোনও তুলনাই ছিল না। সচরাচর কেউ তাদের সঙ্গে কোনও রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে সাহস পেত না। কারণ সকলেই মনে করত যে দরকার পড়লে এনারা সিন্দুক খুলে যথেচ্ছ টাকা খরচ করে ফেলতে পারেন। এহেন সেই সিন্দুক খুলে একবার ধনসম্পত্তি পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হল। একদিকে চন্দ্রমোহন রায়, কেশব চন্দ্র রায় আর বিহারিলাল রায়। আরেকদিকে সর্বচন্দ্র রায় আর ঈশান চন্দ্র রায়। দুই পক্ষের শরিকদের মধ্যে ভীষণ বিবাদ আর ঝগড়াঝাঁটির সৃষ্টি হল। সিন্দুকের ঐশ্বর্য নিয়ে ঈশান বাবুর পক্ষের সন্দেহ দেখা দেওয়ার ফলে তিনি সেটা সবার সামনে খুলে তার মধ্যেকার ধনরত্ন ভাগাভাগি করে নিতে চাইলেন।

দুই পক্ষের মন কষাকষি একেবারে চরমে গিয়ে উঠল। মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।

এই ঘটনার ফলে শরিকদের মধ্যে একটা বিভাজন দেখা দিল। যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরোটুকরো হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তখন তারা সকলে গিয়ে সরকার বাহাদুরের শরণাপন্ন হলেন। অতএব কৃষ্ণনগর থেকে কালেক্টর আর ম্যাজিস্ট্রেট সহ উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীদের নাকাশীপাড়ার জমিদার বাড়িতে পাঠানো হল। সবার সামনে ওনারা সিন্দুকের দরজা খুলে দেখতে পেলেন সেখানে কয়েকশো পুরনো টাকা, সিকি আধুলি ছাড়া আর কিছুই নেই।

এই দৃশ্য দেখে তো সকলে একবারে অবাক হয়ে গেল। বিশেষ করে ঈশান বাবু। তিনি তো অগাধ ঐশ্বর্যের ভাগ পাবেন বলে আশা করে বসে ছিলেন। সিন্দুক খোলার পরে তিনি একেবারেই হতাশ হয়ে পড়লেন। সেই সঙ্গে সমস্ত একরকম দর্শকেরাও আশাহত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। কেশব বাবু বললেন যে ঘরের দরজা তো আর এর আগে কখনই খোলা হয়নি। কাজেই সিন্দুকের মধ্যে যা ছিল, তাইই রয়েছে। নিশ্চয়ই পূর্বপুরুষেরাই ঐ ধনরত্ন সব খরচ করে গিয়েছেন। আর যা কিছু বাকি ছিল সেসব সিন্দুকের ভিতরেই পাওয়া গিয়েছে।

কিন্তু সেই কথা ঈশান বাবুর দলের মোটেই বিশ্বাস হল না। তাদের দাবি অপরপক্ষ নিশ্চিত সেখান থেকে টাকাপয়সা আত্মসাৎ করেছে। আর সেই সঙ্গে অন্য শরিকদেরও ঠকিয়েছে। কিন্তু এর স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ না থাকায় সেই অপবাদ ধোপে টিকল না। মাঝখান থেকে দুই পক্ষের শরিকদের মধ্যে একটা মারাত্মক মতবিরোধ তৈরি হল যা আর কখনই জোড়া লাগল না। এরপর থেকে দুই দলের মধ্যে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেল। আগে আগে নাকাশীপাড়ার জমিদারদের লাঠিয়ালের ভয়ে সমস্ত নীলকুঠির সাহেবসহ বাকি জমিদারেরা ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত। এই ঘটনার পরে সেই ভয় একেবারে উবে গেল। এরপর থেকে শরিকেরা নিজেদের মধ্যেই লাঠালাঠি আরম্ভ করে দিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি দুই শরিকেরা একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা করত, তাহলেও বোধহয় ঠিক থাকত। কিন্তু রাজপুত রক্ত শুধু মামলাতেই শান্ত থাকতে পারল না। নিজেদের মধ্যেই চোরাগোপ্তা হামলা মারামারি চলতেই থাকল। নিজেদের এলাকার মধ্যে জায়গায় জায়গায় দুটো করে লাঠিয়ালের দল গজিয়ে উঠল। প্রজা আর কর্মচারীদের মধ্যে কেউ ঈশান বাবুর, কেউবা কেশব বাবুর পক্ষ নিল। নিরপেক্ষ হয়ে থাকবার জো কারোর ছিল না। কারণ তাহলে সেই লোককে দুই পক্ষেরই নির্যাতন সহ্য করতে হত। এইভাবে দুই পক্ষের মধ্যে অসংখ্য দাঙ্গা হাঙ্গামা আর তার ফলে প্রচুর মোকদ্দমা দায়ের হতে থাকল। এতে বাবুদের যে কত টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। তাছাড়া রোজ এই কারণে তাদের যেরকম অশান্তি ভোগ করতে হচ্ছিল সে কথা না হয় বাদ দেওয়াই ভালো। জমিদারির বেশিরভাগ টাকা লাঠিয়ালদের পেছনেই খরচ হয়ে যেত। তাছাড়া সেই অঞ্চলের অধিবাসীদেরও সেই সব দুর্বৃত্তদের হাতে অশেষ যন্ত্রণা পোয়াতে হচ্ছিল।

কেশববাবু আর ঈশান বাবুর দুটো দলের মধ্যে অবশ্য কেশব বাবুর দলেরই সমর্থকের সংখ্যা বেশি ছিল। আসলে কেশব বাবু যেমন বলবান লোক ছিলেন আর তেমনি মুক্তহস্ত ছিলেন। সেই সঙ্গে তার প্রখর বুদ্ধি আর পরিশ্রমী চরিত্রের কারণে লোকের কাছে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে পরতেন। তার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত। কেশব বাবু ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী। ভয় কী জিনিস তা একরকম তার কাছে অজানাই ছিল। সেই কারণে তিনি তার লাঠিয়ালদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। আসলে যোদ্ধারা তো একজন যোদ্ধাকেই সম্মান করবে, এ তো জানা কথা। তাই কেশব বাবুর অধীনে লাঠিয়ালরা কম মাইনেতেও দলে যোগদান করে ফেলত। তিনি যে লড়াইয়ে নিজে যেতেন, সেদিন তার দলের লাঠিয়ালরা নাচতে নাচতে এগিয়ে যেত। কারণ তারা নিশ্চিন্ত জানত যে জিত সেদিন তাদেরই হবে। কেশববাবু খুব একটা লম্বা ছিলেন না। কিন্তু

গাঁট্টাগোট্টা চেহারা ছিল তার। গায়ের রং কালো, মুখখানা গোল মতোন। গলার স্বর গম্ভীর। লোকে তাকে দেখলে সম্মান আর ভয় না করে থাকতে পারত না। আসলে কিন্তু তিনি বেশ মিষ্টভাষী আর সদালাপী লোক ছিলেন। যে যেমন লোক তার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করতে পারতেন। আবার তার অনেক দোষও ছিল। যদিও আজকে তিনি আর বেঁচে নেই। মৃত লোকের দোষ নিয়ে কথা বলাটা ঠিক হবে না। অন্যদিকে ঈশানবাবুও যথেষ্ট বলবান লোক ছিলেন। কিন্তু তার চেহারা একটু মোটা হওয়ার জন্যে তিনি বেশি পরিশ্রম করতে পারতেন না। তার জনপ্রিয়তাও অনেকটাই কম ছিল কেশববাবুর তুলনায়। লোকের কাছে ঈশানবাবুর পরিচয় ছিল তিনি কেশব বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী।

কেশববাবু আর ঈশানবাবুর বিরোধের ঘটনা কৃষ্ণনগর জেলার এমন অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল যে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আজকে ঈশানবাবু কেশববাবুর একটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিলেন, তো কাল কেশববাবু ঈশানবাবুর একটা গ্রাম লুঠ করে নিলেন। আজকে ঈশানবাবুর এক প্রজাকে নির্যাতন করার জন্যে তার মাঠের ধান কেটে নিয়ে এলেন, তো পরেরদিন কেশববাবু একটা গোলার ধান লুঠ করে তার প্রতিশোধ নিলেন। এক জায়গায় একজন প্রজা নিরুদ্দেশ হল আর আরেক জায়গার কয়েকজন অধিবাসীকে প্রতিপক্ষ ধরে এনে বেদম মারধোর করে আটকে রাখল। এইভাবে ফৌজদারি আদালতে দুই পক্ষের রাশি রাশি মামলা মোকদ্দমায় একেবারে ভরে গেল। তখন মন্ট্রেসর সাহেব ছিলেন কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট আর হিউএট সাহেব ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আমি হিউএট সাহবকে চিনতাম না। কিন্তু মন্ট্রেসর সাহেবকে আমি খুব ভালো করেই চিনতাম। তিনি খুব তেজস্বী আর প্রখর বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। অবাক করার মতো একটা ব্যাপার হল উনি অনর্গল বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারতেন। চোর ডাকাতদের থেকে অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করতে মন্ট্রেসর সাহেব ওস্তাদ ছিলেন। কিংবা জমিদারদের ঝামেলা মেটাবার জন্যেও ওনার কাছে সবসময় নানান ধরনের উপায় মজুদ থাকত। সে যা হোক, এমন দক্ষ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও নাকাশীপাড়ার জমিদারদের বিবাদের জটিলতায় একেবারে অসহায় হয়ে পড়লেন।

তিনি নানা জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করলেন। জমিদারদের কঠিন শাস্তি দেবেন বলে ভয় দেখালেন। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না। অবশেষে কৃষ্ণনগরের সমস্ত জমিদারদের তলব দিয়ে কাছারিতে আনিয়ে তিনি আদেশ দিলেন যে তাঁর অনুমতি না নিয়ে কেউ যদি কৃষ্ণনগরের বাইরে যায়, তাহলে তিনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে জেলে পুরবেন। তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সকাল ছ'টা থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত নিজের কুঠিতে অফিস করতেন। সেখানে কয়েকজন আমলা হাজির থেকে সমস্ত থানার রিপোর্ট তাকে শুনিয়ে হুকুম লিখিয়ে নিয়ে যেত। আর বাকি দরকারি কাজও সেই সময়ে তিনি করে ফেলতেন। তারপর দুপুর দুটো নাগাদ কাছারিতে এসে বিচারাদি সম্পন্ন করতেন। এই শেষ বেলার কাছারি কোনও কোনোদিন সন্ধেবেলা পর্যন্ত চলত।

মন্ট্রেসর সাহেব নাকাশীপাড়ার জমিদার বাবুদের এনে আদেশ দিলেন যে তারা সবাই একেবারে সকালবেলা ওনার বাড়ির অফিসে এসে হাজিরা দিয়ে যাবেন। তারপর আবার দুপুরবেলা সদর কাছারিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে একেবারে সন্ধেবেলা নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যাবেন। জমিদারদের এইভাবে নজরবন্দি করার কারণ এই যে মন্ট্রেসর সাহেব বিলক্ষণ জানতেন যে এরাই নিজেরা নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে থাকে। যদিও ক্যাপটেন নিয়োগ করে তাদের অধীনে দাঙ্গার জায়গায় লাঠিয়াল পাঠাবার অভ্যাস এসব জমিদারদের নেই। তাই তিনি মনে করলেন যে জমিদারদের সারাটা দিন কৃষ্ণনগরে আটকে রাখতে পারলে নিশ্চয়ই এদের দাঙ্গা রুখে দেওয়া যেতে পারে।

এখানে পাঠকদের জানার জানিয়ে রাখি যে কৃষ্ণনগর থেকে নাকাশীপাড়ার দূরত্ব প্রায় দশ ক্রোশ। সুতরাং সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে থেকে রাত্রিবেলা জমিদারেরা ঐ দশ ক্রোশ পেরিয়ে নাকাশীপাড়া যেতেও পারবে না। আর পারলেও পরদিন সকালের মধ্যে ফিরে এসে আবার যথাসময়ে হাজিরা দিতে পারবে না। তার উপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম যে খেয়াঘাটে কাউকেও তাঁর আদেশ ছাড়া পারাপার করানো যাবে না। এই জন্যে তিনি খেয়াঘাটের সামনে কয়েকজন পুলিশ পাহারার ব্যবস্থাও করে দিলেন। এইভাবে সমস্ত আটঘাট বন্ধ করে দিয়ে মন্ট্রেসর সাহেব মনে মনে একটু হলেও আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। তিনি ভাবছিলেন যে এইবারে একটু শান্তিতে থাকা যাবে কিছুদিন। কিন্তু তাঁর সেই আশায় জল ঢেলে দিলেন কেশব বাবু। কীভাবে? এবার সেটাই আপনাদের বলব।

পলাশীর বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণে মিড়া নামে একটি গ্রাম ছিল। কৃষ্ণনগর থেকে মিড়া প্রায় বিশ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। সেখানে বেশ কয়েক ঘর অবস্থাপন্ন মুসলমানের বাস ছিল। বলাই বাহুল্য সেটা নাকাশীপাড়ার আওতাধীন। মিড়াতে ঈশানবাবুর একটা কাছারি আর গোলাবাড়ি ছিল। সেখানকার প্রজারা সকলেই ঈশানবাবুর পক্ষে। কেশববাবু অনেকদিন থেকেই ঐ গ্রাম দখলের চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ঈশানবাবুর সতর্কতায় সেটা আর হয়ে উঠছিল না। এবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সকলকে নজরবন্দি করাতে ঈশানবাবুর মনে বিশ্বাস জেগেছিল যে এই অবস্থায় তার কোনও ক্ষতিই কেউ করে উঠতে পারবে না। এই ভেবেই তিনি মিড়া থেকে অস্ত্রধারী লোকেদের সরিয়ে নিয়ে গেলেন। কেশববাবু এই খবর পেয়েই নড়েচড়ে বসলেন। আর কৃষ্ণনগরে বসেই মিড়া দখলের জন্যে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিলেন। কৃষ্ণনগরের ওপারে মায়াকোল গ্রাম থেকে মিড়ার দক্ষিণে দেবগ্রাম পর্যন্ত তিন চারটে জায়গায় দু-দুটো করে ঘোড়া রেখে দিলেন। আর ঐ সব গ্রামগুলোতে তিন চারশো লাঠিয়াল আর অস্ত্রধারী লোক জমায়েত করতে আদেশ দিয়ে দিলেন। এর পরে একটা নির্দিষ্ট দিনে কেশব নিয়ম মতো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে হাজিরা দিয়ে বিকেল বিকেল বেরিয়ে পড়লেন। ফেরার পথে তিনি পালকি না নিয়ে নিজের কয়েকজন লোকসহ পায়ে হেঁটেই নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তারপর সন্ধ্যা নামার একটু পরে কাঁধে একখানা চাদর নিয়ে বাড়ি থেকে ধীরে ধীরে খেয়াঘাটের দিকে হাওয়া খেতে বেরলেন। সেখান থেকে নদীর ধার দিয়ে কৃষ্ণনগরের ভিতরের এক পল্লিতে পৌঁছে গেলেন। সেখানে খানিক বিশ্রাম নিয়ে এক মাঝির নৌকো চড়ে নদী পার হয়ে দুর্গম মাঠের রাস্তা ধরে প্রায় দু- ক্রোশ পথ হেঁটে একটা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তার জন্যে ঘোড়া রাখা ছিল। ব্যস, কেশব বাবুকে আর পায় কে? আমাদের কাছে দু-চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করা যেমন কোনও ব্যাপার নয়। ঠিক তেমনি কেশববাবুর কাছে ঘোড়ায় চড়ে পনেরো বিশ ক্রোশ পথ পেরোনো কোনও ব্যাপারই ছিল না। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও কেশববাবু লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে তিরের বেগে সেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। দেখতে না দেখতে তিনি পনেরো ক্রোশ পথ পার হয়ে দেবগ্রাম আর বিক্রমপুর গ্রামে যে সব অস্ত্রধারী লোক তার জন্যে অপেক্ষা করছিল তাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারা তো কেশববাবুকে দেখে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। তারপর সবাই মিলে রওনা দিল মিড়ার উদ্দেশ্যে।

রাত বারোটা নাগাদ তারা গিয়ে পৌঁছল মিড়াতে। ওদিকে ঈশানবাবুর লোকেরা কিছুই জানত না এই ব্যাপারে। তাই তারা আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কেশববাবু অতর্কিতে লোকজন নিয়ে প্রথমে ঈশানবাবুর কাছারি আর কয়েকজন প্রধান প্রজার বাড়ি লুঠ করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর সেখানে নিজের কয়েকজন অস্ত্রধারী লোককে আর কর্মচারীকে

বসিয়ে মিড়া গ্রামের দখল নিয়ে নিলেন।

এই সব কাজ সারতে তার ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগেনি। গ্রামের দখল নেওয়া হয়ে যাওয়ার পর তিনি আবার ঘোড়ায় চড়ে কৃষ্ণনগরে ফেরার পথ ধরলেন। সকাল হওয়ার অনেক আগেই তিনি বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। তারপরে ভোর হতেই গঙ্গাস্নান সেরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে যখন পৌঁছলেন, সেখানে তখনও আমলারা কেউ এসে পৌঁছয়নি। সাহেবের কানে গত রাতের খবর কিছুই পৌঁছল না। কারণ আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন মিড়া থেকে ডাক হরকরা ছাড়া একজন পদাতিক একদিনে কৃষ্ণনগর আসতে পারত না। তাই সাহেবের কাছে ঐ কীর্তির কথা পৌঁছল তারও পরদিন। তিনি তো সেই খবর শুনে অবাক।

তবুও তিনি এই ঘটনার কথা জজসাহেবকে জানিয়ে একটা মামলা দায়ের করলেন। জজাসাহেব কেশববাবুকে ছয়মাসের জেল হেফাজতের আদেশ দিলেন। রায় শুনে কেশববাবু যারপরনাই অবাক হয়ে আপিল করলেন এই বলে, "মন্ট্রেসর সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন যে আমি সন্ধ্যার একটু আগে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম। আবার পরদিন সকাল সকাল তাঁর আমলাদের হাজির হওয়ার আগেই আমি সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তাহলে আমি কী করে এক রাতের মধ্যে বিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে অপরাধ করে আবার এখানে ফিরে আসতে পারি? এই কাজ তো যে কোনও মানুষের পক্ষেই অসাধ্য।"

জজসাহেব তাঁর রায়ে লিখে দিলেন যে, কেশববাবু যে সব কারণ দেখিয়েছেন, সেটা অন্য কোনও মানুষের পক্ষে শুধু কঠিন নয় দুঃসাধ্যও। অথচ সেটা কেশবের মতোন লোকের কাছে কিছুই নয়। সে একরাতের মধ্যে চল্লিশ ক্রোশ কেন তার অনেক বেশি পথও অতিক্রম করতে পারে। অতএব কেশবের শাস্তি বহাল রইল। কিন্তু কেশববাবু সদর আদালতে আবার আপিল করে কোনোমতে ছাড়া পেয়ে গেলেন। আমি আগেই বলেছি যে কেশববাবুর হাঁকডাক, হম্বিতম্বির জন্যে সাধারণ লোকে তাকে যমের মতোন ভয় করত। এমনকি তার পায়ের আওয়াজ শুনলেও তার চাকরবাকর কিংবা প্রজারা ভয়ে কেঁপে উঠত। শুধু নিজের লোকই নয়, তার বিরোধীপক্ষের লোকজনেরাও তাকে বেশ ভয় পেত।

এই প্রসঙ্গে আপনাদের একটা মজার কথা শোনাই। নিম্ন আদালতে জজসাহেবের সামনে ঈশানবাবুর একজন সাক্ষী নিজের জবানবন্দি দিচ্ছিল। সে সময় নিয়ম ছিল যে সাক্ষীদের কথা একজন আদালতের কর্মচারী বিচারকের সামনেই লিখে নিয়ে সবার সামনে পড়ে শোনাত। তারপর দুই পক্ষের উকিলদের জেরার পর্ব চলত। কেশববাবু আদালতে ঢুকতে না ঢুকতেই একজন সাক্ষীকে জবানবন্দি দিতে দেখলেন। সাক্ষী বলে যাচ্ছিল যে সে নিজের চোখে দেখেছে, কেশববাবু ঘোড়ায় চড়ে দাঙ্গা করছেন। সেটা শুনতে পেয়েই কেশববাবু বলে উঠলেন, "কী রে ব্যাটা আমার নামে কী সব কথা বলছিস?"

ব্যস, সেই সাক্ষী এতক্ষণ কেশব বাবুকে দেখতে পায়নি। যেই না তার গলার আওয়াজ তার কানে গিয়েছে, অমনি সে "ওমা, কেশববাবু যে"বলে প্রাণপণ দৌড়ে একেবারে আদালত চত্বর থেকে পগারপার। এই কাণ্ড দেখে স্বয়ং জজসাহেব পর্যন্ত অবাক। তিনি বলেই ফেলেন, "দেখো কাণ্ড, এরা আমার সামনে থেকেও কেশবের ভয়ে পালিয়ে গেল। এইভাবে আমি কার বিচার করব, আর কীভাবেই বা করব।"

কেশববাবুর যেমন একদিকে দৌরাত্ম্য ছিল, তেমনি আবার আরেকদিকে দানধ্যানও প্রচুর ছিল। কোনোরকম দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করতে তিনি কোনোদিন পিছপা হননি। সাধারণের উপকারের জন্য কেশববাবু নানান জনকে টাকা বিলিয়ে যেতেন।